খেলা

This Book Downloaded From
www.Doridro.com

দিব্যেন্দু পালিত

ভুতুর জন্মের পর অক্লেশে বদলে যায় পৃথিবী। চারিদিকের আলো হাওয়ার সংস্পর্শে ফুটে ওঠে আশ্চর্য সব রঙ, চোখে যদিও দেখা যায় না কিছুই।

সকালের রোদ্দুর এসে হাত বুলিয়ে যায় বিনয়ের চুলে—ডেকে তোলে ক্লান্ত ঘুম থেকে, ওঠো সুদিন আসছে। ছুটি শেষের রাস্তায় বিকেলের হাওয়া উড়ে চলে নির্দিষ্ট দিকে, তারপর যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায় একটু, ফিরে এসে মুখচেনা হেসে বলে, এই তো! পিঠ সোজা করে হাঁটো—সুখবর পাবে। বাসে ট্রামে এতো ভিড়, গিসগিসে মানুষজনের গা থেকে ভুরভুর করে বেরিয়ে আসে সুগন্ধী ঘাম। মায়াময় তাদের চোখমুখ—পাশ খালি হলেই বিনয়কে ডেকে নেয় বসবার জন্যে। আজ খুব গরম, তাই না! আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে কেউ, বৃষ্টি হবে। অফিসে দিনেশবাবু খুব কড়া লোক, ভুরুর খাঁজে খাঁজে লুকিয়ে রাখেন ডিসিপ্লিন কথাটা—এমন কি তাঁকেও মনে হয় অমায়িক আর ক্ষমাশীল। সাহস বেড়ে যায় বিনয়ের। অনেকদিন পরে মনে হয় বেঁচে থাকার একটা মানে সে খুঁজে পাচ্ছে।

একদিন বিকেলে চুপিচুপি এগিয়ে গিয়ে দিনেশের টেবিলের সামনের খালি চেয়ারটায় বসে বিনয় বলে, 'দিনেশদা, একটা কথা ছিল।'

'বলো—'

অল্প আমতা-আমতা করে লজ্জাটা কাটিয়ে নেয় বিনয়। বলে, 'দিন কয়েক ছুটি নেব ভাবছি।'

'ছুটি! এই সময়!' বুকে চিবুক ঠেকিয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে চোখ গলিয়ে দেয় দিনেশ, 'কার আসুখ? তোমার তো মাও নেই, বাবাও নেই!'

'না, না। অসুখ-টসুখ নয়।' লজ্জা পেয়ে বলে বিনয়, 'ইয়ে—'

'কিয়ে!'

'এমনিই। মানে, রিণা পরশু একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছে। তাই ভাবলাম একটু—'

'রিণা কে?'

চারিদিকের পরিবর্তন বিনয়ের লজ্জাটাকে সুন্দর করে তোলে। দিনেশকে ক্ষমাশীল ভাবতে গিয়ে নিজেও হয়ে ওঠে ক্ষমাশীল। এতোদূর অজ্ঞতায় রাগ হয় না একটুও। হেসে বলে, 'রিণা মানে আপনাদের বউমা—'

'অ। তাই বলো! বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়েছিলুম বটে, কার্ড তো আর পড়ে দেখিনি।' বলতে বলতেই ফাইলপত্রে মনোযোগী হয়ে ওঠে দিনেশ। একটা কাগজের মার্জিনে নোট লিখতে লিখতে বলে, 'করেছে মানে তো পাস্ট টেনস্! হয়ে গেছে। এতো খুশি হয়ে যখন বলছ, নিশ্চয়ই ভালো আছে। ছুটিটা কি জন্যে?'

'একটু আমোদ করতাম।'

'ও, আমোদ!' দিনেশ জের টানে, 'আমার ছেলেমেয়ের সংখ্যা ন'টি। গতবছরেও হয়েছে একটি। আমোদ ব্যাপারটা কী হে? জানলে পাওনা ছুটিগুলো সব নিয়ে নেব।'

'পাবো না!'

'বুঝে দ্যাখো। ছুটি পাওনা থাকলে নেবে বইকি!'

অল্প মুষড়ে পড়ে বিনয়। এ-বছরে একটাও ক্যাজুয়াল লিভ নেয়নি সে। সিকও হয়নি। প্রমোশন হলেও হতে পারে ভেবে প্রতিদিন অফিসে উপস্থিত থেকে কাজ করে যাচ্ছে মন দিয়ে, যাতে ভুলচুক না হয়, একটাও খুঁত চোখে না পড়ে দিনেশের। নিজের মাথাটা যে একটু বোকা—মনটাও ভুলো, এটা বুঝতে পেরে কিছুদিন থেকে সে চতুরও হয়েছে সামান্য। কষ্টের সংসার তার—রিণার নিপুণ হাত সারাক্ষণ গুছিয়ে চলে বলেই চলে যাচ্ছে কোনরকমে। ঘরের সামনে ছোট্ট উঠোনে টবের মাটিতে সযত্নে লঙ্কা ফুটিয়েছে রিণা। বিকেলের শেষ দিকে প্রায়ই মুড়ি আনিয়ে খায় দিনেশ; মুড়ির সঙ্গে এক-এক গরসে এক-একটা লঙ্কা খেয়ে যখন ঢেঁকুর চাপা দেয়—বড়োই পরিতৃপ্ত লাগে তাকে। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে একদিন রিণার তৈরি এক ঠোঙা লঙ্কা এনে উপহার দিয়েছিল দিনেশকে। খুশি হয়ে, চিবিয়ে, দিনেশ বলেছিল, 'খাসা হে। বোঝাই যায় যত্ন আছে।' শুনে বেশ চনমনে বোধ করেছিল বিনয়। এই লোকটার হাতেই তো সব—এই লোকটা রেকমেণ্ড করলেই ঘাড় গুঁজে মেনে নেবে অফিসাররা।

সেদিন রাতে পোস্তবাটা আর কাচালঙ্কা দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে রিণাকে বলেছিল বিনয়, 'তোমার হাতে লঙ্কাও দেখি মিষ্টি হয়ে যায়!'

'আহা!' রিণার লজ্জাটা আধফোটা হয়ে থাকে, 'কী বলল গো? খুশি হয়েছে তো? এ-বছর দেবে তো?'

'দেখি—।' ভাতের থালার সামনে ক্ষুধার্ত বিনয়ের মুখে উদাসীন ছায়া পড়ে,

'না দিলেও চলে যাবে—'

'আরেকটু পোস্ত নাও।' রিণা বলে, 'নিজেদের জন্যে কবে আর ভেবেছি!'

দিনেশের আজকের কথাবার্তার পর খটকা লাগে একটু। মনটা দমে যায়। তবু, ভুতুর জন্ম একটা আলাদা ব্যাপার। পৃথিবীতে চন্দ্র-সূর্যের অতর্কিত ব্যবহারে যার আচরণে তারতম্য ঘটে না এতোটুকু, বন্যা কিংবা ভূমিকম্পে মানুষের মৃত্যুর খবর শুনে তাকিয়ে থাকে অযাচিত চোখে—স্ট্রাইকের দিনেও তিন মাইল হেঁটে এসে সই করে হাজিরা খাতায়, নিজেকে আবিষ্কারের আনন্দে হঠাৎই ঠাসা বোধ করে সে। ভাবে ছুটি তো অনেক—সবই প্রাপ্য, দু'দিন ডুব দিলে কে আর কী বলবে! সে তো বানিয়ে বলেনি কিছু! আমোদ কী, তাও বোঝে না ঠিক-ঠিক। তবে আমোদ করতে ইচ্ছে করছে, ইচ্ছেটাকে চিনতে পারছে, এই যা। আধ মাইল লম্বা মালগাড়ির শেষ বগীটার মতো জীবন তার—এর আগে মাঝে মাঝে নিজেকে খুব ক্লান্ত আর দুঃখী মনে হলে এক-একদিন নিজেকে এইভাবে গড়িয়ে দিত বিনয়। ভুতুর জন্ম একটু অন্যরকম করে দিল তাকে।

সেদিন হাসপাতালে ঢুকবার আগে এক ঠোঙা কমলালেবু কিনে নেয় বিনয়। মেটারনিটি ওয়ার্ডের বেডে রিণাকে খুঁজে নিয়ে বলে, 'তোমার জন্যে। দু'বেলা দুটো করে খেও। ভিটামিন।'

রিণা লক্ষ্য করে খুব মন দিয়ে পাশে রাখা কটের ভিতর কাঁথা-জড়ানো ছোট্ট মানুষটির দিকে তাকিয়ে আছে বিনয়। অন্য চেহারা। অফিস-শেষের ক্লান্তি নেই, খাইখরচার ভাবনা নেই এতোটুকু। বেলাশেষের দয়ালু রোদ আদর বুলিয়ে যাচ্ছে মুখে আর কপালে। বেডের ওপর পা ছড়িয়ে বসে দেখতে দেখতে খুশিতে ডমমগ হয়ে ওঠে রিণা। লজ্জাও পায় অল্প। তবু বলে, 'ওভাবে তাকিয়ে আছ!'

'দেখছি—।' বিনয় হাসে। বলে, 'ব্যাটা ভূত! ঘুমোচ্ছে যেন সাড় নেই!'

'বাপের স্বভাব। এখনই বোঝা যাচ্ছে—'

একটু আনমনা হয়ে যায় বিনয়। কিছু ভাবে যেন। বেডের পাশে রাখা বেঞ্চিটায় বসে পড়ে আস্তে আস্তে।

'বাপ কি ঘুমোয়!'

'না। তার খালি টাকার চিন্তা। সংসারের চিন্তা। ঘুমোবে কী করে!' ডান হাতে ভর দিয়ে কোমর বেঁকিয়ে কাছ খুঁজে নেয় রিণা। বলে, 'ওর বুকে নাকি ছোট্ট একটা জড়ুল আছে। নার্স কমলাদি বলছিল মঙ্গলচিহ্ন!'

বিনয় তেমনিই হাসে। চুপচাপ। একবার স্ত্রীর দিকে তাকায়। চোখ সরিয়ে সরিয়ে নিয়ে যায় ঘরভর্তি প্রসূতিদের ওপর। তারই মতো কেউ না কেউ কারো কাছে বসে। একেবারে কোণের দিকে ফরসা বউটির কাছে অনেকে। রিণা ততো ফরসা

হাসিতে অল্প কেঁপে যাচ্ছে শিশুটির ঠোঁট। ভারী মজা তো! একটা খেলা পেয়ে যায় বিনয়। আশেপাশে তাকিয়ে উদ্যত হাততালিটা টেনে নেয় মনে। বিড়বিড় করে বলে,ঘুমো, তুই ঘুমো! যখন আর একটু বড় হবি, কথা বলবি, হাঁটবি টলমল পায়ে— আমার সমস্ত ভুলে-যাওয়া খেলাগুলো শিখিয়ে দেব তোকে।

রিণা খুব আড়ষ্ট হয়ে থাকে। নিচু গলায় বলে, 'ওরকম একটা বাচ্চাদের কটের অনেক দাম, না গো?'

'তোমার ইচ্ছে?'

'না।' রিণা বলে, 'ন্যাড়া তক্তপোষ আমাদের। ভয় লাগে বড়—'

'ভিতু!' অন্যমনস্ক হতে হতে বিনয় বলে, 'দাম হোক। কিনে দেব।'

আমোদ করার ইচ্ছেটা তুলে রাখে বিনয়। পরের দিনও চলে যায় অফিসে। শশাঙ্ক চৌধুরী কোঅপারেটিভের লোন-টোন দ্যাখে। টিফিনে তাকে আলাদা ডেকে বলে, 'শশাঙ্কদা, শ দুয়েক লোন পাওয়া যাবে?'

'লোন নেবে? কী করবে?'

'বাচ্চাটার জন্যে কট কিনব একটা। দরদাম করেছি, যা বাজার! শ দুয়েকের নিচে কিছু নেই—'

'গরীবের ঘোড়া রোগ কেন!' শশাঙ্ক বলে, 'যা আছে তাতেই শোয়াও। ঠিক বড় হয়ে যাবে—'

বিনয় একটা ঘা খায়। খেলাটা থিতিয়ে পড়ে হঠাৎ। সামলে নিয়ে বলে, 'কোনোদিন তো চায় না কিছু! বউয়ের ইচ্ছে—'

'তাহলে দিতেই হয়। নতুন মা-হওয়া মেয়েদের ইচ্ছে বড় বিষম। ফেলতে নেই।' চোখে দয়া মাখিয়ে তাকায় শশাঙ্ক, 'তবে, ভাই, খরচ-খরচা একটু বুঝে-সুঝে কোর। আগের লোনটার কথা মনে আছে তো?'

চুপচাপ নিঃশ্বাস ফেলে বিনয়। টেনে নেয় আবার।

'দেব। দিয়ে দেব।'

একটা নতুন কট পেয়ে যায় ভুতু। ঘুপচি, সোঁদা ঘর। তবু সকালের আলোয় দিব্যি ভরে ওঠে আজকাল। রিণার বুক থেকে অক্লান্ত দুধ টেনে নাদুস-নুদুস হাত-পাগুলো নেড়ে, নিদাঁত মাড়ি বের করে হাসে গি-গি করে। নানারকম শব্দ করে মুখে। বিনয় তাকিয়ে থাকে, দ্যাখে—দেখতে দেখতে হঠাৎই শিরশির করে ওঠে চোখের কোণ। শিশু হয়ে শব্দগুলো ফিরিয়ে দেয় ভুতুকে। ভাবে। ভাবতে ভাবতে টের পায়, নতুন করে বুকের মধ্যে শুরু হচ্ছে খেলা।

রিণা তাড়া দেয়, 'ছেলে নিয়ে থাকলেই হবে! অফিসে যাবে না?'

'যাব—।' বিনয় বলে, 'যাচ্ছি—'

খেলা যতই জমে ওঠে আর আস্তে আস্তে বড় হয়ে ওঠে ভুতু—ব্যবহারের শব্দগুলো ততই কমে আসে বিনয়ের। হারিয়ে যায় কথা। টের পায় কথার ছেড়ে যাওয়া জায়গাগুলো ক্রমশ ভরে উঠছে অদ্ভুত বোধে আর অনুভবে। তার সবগুলো সে চিনতেও পারে না ঠিকমতো। খেলা যতই জমে ওঠে, কেন যেন মনে হয় তার খুশির পাশাপাশি চুপিসাড়ে দখল নিতে এগিয়ে আসছে একটা আশঙ্কা—বদলের রূপগুলো ঝরে যাচ্ছে ক্রমশ। তবু প্রাণপণে চেষ্টা করে বিষণ্ণতা কাটিয়ে উঠতে। মনে পড়ে ভুতুর মুখ। খড়খড়ে মেঝের ওপর নরম হাঁটু ঘষে এখন সে হামাগুড়ি দিয়ে ছুটোছুটি করছে রিণার পিছুপিছু। অস্ফুট কথা বলে চেষ্টা করছে দেয়াল ধরে দাঁড়াতে—খাবার মনে করে মুখে পুরছে পুরনো দেয়ালের পলেস্তরা। মনটা এলোমেলো হয়ে যায় বিনয়ের। অস্বস্তি লাগে; আগের চেয়ে আরো একটু কুঁজো হয়ে ঝুঁকে পড়ে কাজে। হাসে। দিন যায় নি। খেলাটা আবার ফিরে আসে বুকের মধ্যে।

সে বছরও কিছু হয় না বিনয়ের। কেউ কেউ খবর পায়, সে পায় না। মাইনের অঙ্কে চোখ বুলিয়ে ঝপ্ করে টাকাগুলো লুকিয়ে ফেলে পকেটে। লজ্জা লাগে বড়। সীটে ফিরে গিয়ে অসহায় চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে দিনেশের দিকে। ব্যস্ত মানুষ, কাজ ছাড়া আর কিছু চেনে না। সবাই বলে, অফিস চালায় দিনেশবাবু।

সেদিন বাড়ি ফিরতে একটু বেশিই দেরি হয়ে যায় বিনয়ের। ট্রামে বাসে না চড়ে আনমনা হেঁটে যায় অনেকটা—অভ্যস্ত দুঃখ এতটুকু ক্লান্ত হতে দেয় না তাকে। কী ভেবে মোড়ে দাঁড়ানো বেলুনওয়ালার কাছ থেকে লাল নীল হল্‌দে সবুজ বেলুন কিনে নেয় চারটে। নিজের কাজে খুব বেশি হাসি পেয়ে যায় তার—প্রশ্রয় পেয়ে অনেকদিন পরে ফিরে আসছে হারানো খেলাটা। এত দেরি পর্যন্ত জেগে থাকবে না ভুতু। কিন্তু কাল সকালে রঙীন বেলুনগুলো দেখে চমক পাবে নিশ্চয়ই।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দেয় রিণা। কোলে ভুতু। প্যাঁটপেঁটে চোখে বেলুনগুলোর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে একগাল। হাত বাড়ায়।

ঝপ্ করে নিজেকে লুকিয়ে নেয় বিনয়। বলে, 'ব্যাটা ঘুমোয়নি এখনো!'

'কোথায় ঘুম!' রিণা বলে, 'কতবার চাপড়ালাম, আলো নেবালাম—কিছুতেই কিছু নয়! খালি 'বাব্' 'বাব্' করে যাচ্ছে! কী যে বাবা-অন্ত প্রাণ!'

'আয় দেখি কেমন বাবা-অন্ত প্রাণ তোর!' বেলুনগুলো রিণার হাতে তুলে দিয়ে ছেলেকে কোলে টেনে নেয় বিনয়, 'টাঙাও দেখি—'

'এগুলো কিনলে!' একটুক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে রিণা জিজ্ঞেস করে, 'কোন খবর আছে নাকি?'

'নাঃ।' দু হাতে মাথার ওপর ছেলেকে তুলে ধরে বিনয়। খিলখিল করে হাসে ভুতু—ছোট্ট মুঠোয় চুল চেপে ধরে বিনয়ের। খেলায় মন রেখে রহস্য করে বিনয় বলে, 'আয়ু কম। তাই কিনলাম।'

রিণা আর জিজ্ঞেস করে না কিছু। নিঃশব্দে হেঁটে যায় হেঁসেলের দিকে। যেমন যায়।

রাত্রে খেতে বসে থালায় হাত আঁটকে যায় বিনয়ের। মুখ তুলে বলে, 'দিন দিন কালি হয়ে যাচ্ছে চেহারা। যত্ন নাও না কেন!'

'ওরকম হয়।' নিঃশ্বাস চেপে রিণা বলে, 'ছেলে খেয়ে যাচ্ছে এখনো। ছাড়লে ঠিক হয়ে যাবে।'

হাতটা সচল হতে গিয়েও থেমে যায় আবার। বর্ষার জল-পাওয়া চারার মতো তরতর করে বেড়ে উঠছে ভুতু। দামাল শরীর তার, আজ সন্ধ্যায় দু'হাতে ওপরে তুলতে গিয়েই ভার টের পেয়েছিল বিনয়, কাঁপুনি লাগছিল কনুইয়ের জোড়ে। তিমনি খিদেও। জোগানের দায় রিণার। একদিন একঠোঙা কমলালেবুর ভিটামিনের ছাপ গায়ে মাংস পড়ে না। রিণার দায় তার। এসব ভাবতে গিয়ে কনুইয়ের জোড় খুলে যায় বিনয়ের।

'খাচ্ছ না কেন!' রিণা বলে, 'খাও?'

খাবার নাম করে বিনয়। চাপা দেয়ালের মধ্যে হাওয়া ঢোকে না তেমন, তবু ঠিকই শুকিয়ে যায় থালা। রিণা তার কিছু বোঝে, অনেকটাই বোঝে না। বলতে গিয়ে জড়িয়ে যায় গলা!

'নিজেকে দ্যাখো? তুমি কী হয়েছ!'

'আমার কথা ছাড়ো। আমার কিছুই হয় না, হবেও না।' উপুড়-করা গ্লাসের পুরো জলটা ভুতুর হাসির মতো গলা দিয়ে নেমে ছড়িয়ে পড়ে বিনয়ের গোটা বুকে। হাসতে হাসতেই বলে, 'এবার টুক করে মরে যাব একদিন। টেরই পাবে না কেউ!'

উঠে পড়ে বিনয়। মুখ ধুয়ে ঘরে এসে দাঁড়ায় ভুতুর কটের সামনে। নিঃসাড়ে কাদা হয়ে ঘুমুচ্ছে ভুতু—শান্ত মুখশ্রী, নিঃশ্বাসের টানা-ছাড়ায় অল্প ওঠানামা করছে বুক। মাথা পা কটের দুই প্রান্ত ছুঁয়ে যাচ্ছে প্রায়। ছোট কট আর বেশিদিন ধরে রাখতে পারবে না ওকে। তখন অন্য উপায় ভাবতে হবে।

আলোগুলো নিবিয়ে বিছানায় টানটান হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকে দরজায় খিল তুলে দেয় রিণা। পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে বিছানায়। সময়টা অনুমান করে খটকা লাগে বিনয়ের—উঠে বসে অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে কাঁধ ছোঁয় রিণার। ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করে, 'খেলে না?'

'থাক।'

হাতটা সরিয়ে দেয় রিণা। বিনয় তার কিছু বোঝে, অনেকটাই বোঝে না। থেমে থেমে বলে, 'পিত্তি পড়িয়ে লাভ কী! ওতে শরীর আরো খারাপ হবে—'

রোগা শরীরে হঠাৎ জোর পেয়ে যায় রিণা। চকিতে উঠে বিনয়কে ঠেসে ধরে বিছানায়। বুকে দুমদাম কিলোতে কিলোতে বলে, 'কেন বলবে এসব কথা! কেন বলবে!'

বিনয় বুঝতে পারে না। হাতে জোর নেই রিণার, তুলোর বালিশ আছড়ানোর মতো ভোঁতা শব্দ হয় কয়েকটা। নাকি এটা তার বুকেরই শব্দ!

'কোন কথা! কী বললাম!'

'আমি না হয় ভিক্ষে করব। ছেলেটার কী হবে!'

বিনয় বুঝতে পারে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ভাবে, তাই তো! সে রিণার স্বামী নয়, ভুতুর বাবা নয়—নড়বড়ে একটা দেয়াল। দেয়ালটা ভেঙে পড়লেই ভুতুর হাত ধরে রাস্তায় নামবে রিণা। ভারী মজা তো! ভাবতে ভাবতেই টের পায় আর একটা খেলায় জড়িয়ে যাচ্ছে সে। অন্ধকার ঘরে খোলা জানলা দিয়ে যেটুকু আলো ঢোকে তাতে চেনা যায় না কোন বেলুনটার কী রঙ! শুধু আবছাভাবে দোল খায় সেগুলো।

রিণা কেঁদে নেয় একটু। তারপর সামলে নিয়ে আদরে হাত বুলোয় বিনয়ের মাথার চুলে।

'মাথার ঠিক থাকে না! তোমার লাগেনি তো?'

'নতুন করে আর লাগবে কী! অভ্যেস হয়ে গেছে।' অন্ধকারে হাসে বিনয়, 'তুমি অত ভাব কেন!'

স্বামীর বুকে মাথা নামিয়ে রিণা বলে, 'নিজের জন্যে নয়—'

'ভেব না। রোগা ঘরামির কাটারি বড়—আমার আয়ুও তেমনি। আমি ঠিক বেঁচে থাকব।'

বিনয়ের কথা শেষ হয় কি হয় না। ওরা শুনতে পায় অন্ধকারে খিলখিল করছে হাসির শব্দ। রিণা আগে ওঠে, তারপর বিনয়। দু'জনেই কট ধরে দাঁড়ায়। তাকিয়ে থাকে। খানিক পরে রিণা বলে, 'স্বপ্ন দেখছে—'

দিন যায়। আস্তে, কিন্তু দ্রুত, বড় হয়ে ওঠে ভুতু। এখন সে দিব্যি নিজের পায়ে হাঁটে। কথা বলে গোটা গোটা। বকলে কাঁদে। রাগ হলে রাগে, ধমকায়। বিকেলে রোদ পড়ে এলে রিণার হাত ধরে বেড়াতে যায় পার্কে। দেখতে দেখতে বড় হয়ে যায় আরো একটু।

বিনয়ের কিছুই হয় না। সে যতই হাত বাড়ায়, আঙুলের ফাঁকগুলো বড় হয়ে যায় শুধু। খাটে মন দিয়ে, নড়বড়ে দেয়ালটাকে সোজা রাখার চেষ্টা করে যায়

ক্রমাগত। তাড়াতাড়ি বাড়ি না ফিরে হাঁকুপাঁকু করে ওভারটাইমের জন্যে। খাটতে খাটতে কুঁজে হয়ে যায় আরো। তবু খাটে। খেলাটা জিইয়ে রাখে বুকে।

একদিন ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পকেটে ওভারটাইমের টাকাগুলো কড়কড় করে ওঠে বিনয়ের। ভুতুর জন্য দ্বিতীয় উপহারটি কিনতে গিয়ে মনে পড়ে, কবে ফেটে চুপসে গেলেও বেলুনের চামড়াগুলো এখনো ঝুলছে ঘরের মাথায়। মাঝে মাঝে সেগুলোর দিকে তাকায় ভুতু, কিছু ভাবে, তারপর ভুলে যায় আবার। এসব ভেবে ফুটপাথের দোকানে ঝুঁকে পড়ে বিনয়। রঙীন লাঠির ডগায় ছোট চাকা লাগানো, পাশে ব্রাকেটে আঁটা গোল ক্রিং-ক্রিং ঘন্টি। হাতে পেলে আটখানা হবে ভুতু। ভাবে, কিছুটা গেল, কিছুটা থাকল। পরের ওভারটাইমের টাকাটা রিণার।

দিন যায়।

একদিন অফিস ছুটির পর শশাঙ্কের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বিনয় বলে, 'শশাঙ্কদা আমার কিছু হয় না কেন বলুন তো?'

'কী করে হবে!' শশাঙ্ক বলে, 'ব্যাপারটাই এমন, কারুর হবে—কারুর হবে না। আমার কী হল! আমি দিনেশের এক গ্রেড ওপরে ছিলাম। এখন দিনেশ আমার তিন গ্রেড ওপরে। সবটাই এখন ওর মর্জিতে—'

বিনয় চুপ করে থাকে। ধরতে পারে না।

'এটা অবিচার।' শশাঙ্ক হঠাৎ বলে, 'বুঝলে, এই মিডিলম্যানগুলোই খচ্চরের আঁটি। সরাসরি অফিসারের কাছে গিয়ে প্রেজেন্ট করো না কেসটা? পারবে না যেতে?'

বিনয় শোনে। তারপর পিঠ খাড়া করে বলে, 'যাব?'

'যাবে?' শশাঙ্ক চুপসে যায়। বলে, 'ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া কি ঠিক হবে? দিনেশকে তো চেনো?'

বিনয় জবাব দেয় না। মেরুদণ্ডের খাড়া ভাবটা সহ্য করতে পারে না বেশিক্ষণ। এগোতে গিয়ে পিছিয়ে এসে দু'হাতে নড়বড়ে দেয়ালটাকে ঠেকা দেয় সে। হাঁটু কাঁপে, থরথর করে ওঠে পিঠ—যেটুকু রক্ত আছে সব জড়ো করে আনে হাতে।

'কী করবে বলো তো!' আরো খানিকটা হেঁটে গিয়ে শশাঙ্ক বলে, 'বরং দিনেশকেই খোশামোদ করে যাও—'

বিনয় মাথা নাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় না কোন। তারপর বলে, 'কতই তো করলাম। খোশামোদে কাজ না হলে গ্লানিটা বেড়ে যায় আরো। নিজেকে আর মানুষ বলে মনে হয় না।'

চারিদিকের অন্ধকার সংস্পর্শে হারিয়ে যায় কথাগুলো। ফেরত দেয় না কিছুই।

বাড়ি ফিরতেই দৌড়ে আসে ভুতু। জামা ধরে টানে। বলে, 'বাবা, আমার একটা

ঘোলা চাই—'

This Book Downloaded From
www.Doridro.com

'ঘোলা কী রে!'

'ঘোড়া, ঘোড়া।' রিণা শুধরে দেয়, 'উচ্চারণ করতে পারে না, তবু শখ আছে। দোকানের শো-কেসে কাঠের ঘোড়া দেখে সেই থেকে বায়না ধরেছে!'

'দাম কত?'

'অনেক।' রিণা বলে, 'সে তোমার শুনে কাজ নেই। বায়না ধরলেই হয় নাকি!'

বিনয় জবাব দেয় না। আনমনে হাসে, হাত বোলায় ভুতুর মাথায়। তারপর বলে, 'দেব, বাবা। ঠিক দেব। এখন তোমার সেই ক্রিং-ক্রিং ঘন্টিগাড়িটা নিয়ে খেলা করো। দেখি কেমন পার—'

'সেটা আর আছে নাকি!' রিণা বলে, 'ফুটপাথের জিনিস, কতদিন আর থাকবে!'

সোজাসুজি স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায় বিনয়। তাকিয়েই থাকে। চেষ্টা করে হাসতে। তারপর অন্যরকম গলায় বলে, 'ঠিকই তো! ফুটপাথের জিনিস, কতদিনই আর থাকে!'

রিণার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। এইমাত্র একটা কথা বলে ফেলেছে সে। আড়াল খোঁজার জন্য তাড়াতাড়ি সরে যায় সামনে থেকে।

বিনয় এসব দ্যাখে না। শুধু বুক ফুলিয়ে নিঃশ্বাসটাকে টেনে নিয়ে যায় মাথা পর্যন্ত। টের পায় দূর থেকে ধুলোর ঝড় তুলে বুকের মধ্যে উড়ে আসছে খেলা। তাড়াতাড়ি ভুতুর হাতটা চেপে ধরে সে। বলে, 'কাঠের ঘোড়ায় হবে কি! তোকে সত্যিকারের ঘোড়ায় চড়াবো—'

বলতে বলতে হাঁটু মুড়ে ফেলে বিনয়, তারপর হাত নামিয়ে চারপেয়ে হয়ে ওঠে। বলে, 'আয়। উঠে পড় পিঠে—'

ভুতু ওঠে। 'হ্যাত' 'হ্যাত' শব্দ করে মুখে। ঘাড়ের চুল ধরে টানে। বলে, 'জোরে—জোরে—'

ঘোড়াটা দৌড়তে শুরু করে। বহুদিন দানাপানি না-পাওয়া তার জীর্ণ পেশীগুলো টনটন করে ওঠে যন্ত্রণায়; মনে হয় ফেনা উঠে আসছে মুখে। হাল ছাড়ে না তবু। ধুলোর ঝড় তুলে একটা কাঠের ঘোড়া তাড়া করে আসছে পিছনে—কিছুতেই এগোতে দেবে না তাকে। শিরাগুলো জোঁকের মতো ফাঁপিয়ে তুলে দাপিয়ে দৌড়য় সে। হাঁফ ধরে যায় বুকে। টপ্ টপ্ করে জল পড়তে থাকে চোখ দিয়ে। দৌড়তে দৌড়তেই জিজ্ঞেস করে, 'ভুতু, কোন ঘোড়া ভালো?'

স্বর বেরোয় না কোনো।